# কর্মী শৃঙ্খলা বিধান
## Disciplining Employee

**ইউনিট ১০**

### ভূমিকা

কথায় বলে 'শৃঙ্খলাই জীবন ও শৃঙ্খলাই জীবনের সৌন্দর্য্য' । যেখানে কোন নিয়ম-নীতি নেই সেখান থেকে শৃঙ্খলা বিদায় নিয়ে আসে বিশৃঙ্খলা। আর বিশৃঙ্খলা মানেই ব্যর্থতা আর নৈরাজ্য। শৃঙ্খলা শব্দটি দ্বারা লিখিত বা অলিখিত আচরণবিধি ও নিয়মাবলি অনুযায়ী কাজকর্ম সম্পাদন করাকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের কঠোরভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, তেমনি শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো গুরুতর কোনো অপরাধ ঘটলেও তার উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্ব।একথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের মনোবল ও কর্ম পরিবেশের শান্তি একান্তভাবেই শৃঙ্খলা বিধানের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ জীবন অথবা উৎপাদন কারখানা প্রত্যেকটি জায়গায় শৃঙ্খলা এক অপরিহার্য উপাদান। বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার অভাবে এর সাথে জড়িত প্রতিটি পক্ষ যেমন- কর্মী, নির্বাহী বা মালিক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হতে পারে। তাই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বহু পক্ষের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার চর্চা করা হয়। তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-নীতি এবং আচরণ পরামর্শ। জীবন চলার পথে শৃঙ্খলা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, একটা সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নতির জন্যও শৃঙ্খলা তেমনি অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম হয়। কোনো না কোনো একজন সদস্যও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করলে সংগঠনটির স্বাভাবিক কার্য বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য এ কারণে কোনো কর্মী বা শ্রমিক নিয়মকানুন মেনে না চললে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-১০.১ : শৃঙ্খলা বিধান কী, শৃঙ্খলা বিধান কার্যের উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলা বিধানের পদক্ষেপ
পাঠ-১০.২ : শৃঙ্খলা বিধানসংক্রান্ত নির্দেশনা বিশৃঙ্খলার কারণসমূহ
পাঠ-১০.৩ : শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়া, বাংলাদেশে শৃঙ্খলা বিধানসংক্রান্ত আইন, বিধান কার্যের পদক্ষেপসমূহ
পাঠ-১০.৪ : শৃঙ্খলা বিধানের নীতিমালা, বাংলাদেশে সরকারি অফিসে শৃঙ্খলা, বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের শাস্তি প্রদান পদ্ধতি।

# পাঠ-১০.১ শৃঙ্খলা বিধান কী ,শৃঙ্খলা বিধান কার্যের উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা বিধানের পদক্ষেপ

**What is Disciplinary Action, Objectives of Disciplinary Action, Steps in Disciplinary Action**

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শৃঙ্খলা বিধান কী তা বলতে পারবেন।
- শৃঙ্খলা বিধান কার্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শৃঙ্খলা বিধানের পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

## শৃঙ্খলা বিধান কী?

**What is Disciplinary Action?**

সাধারণত শৃঙ্খলা বলতে নিয়মকানুন মেনে চলার অবস্থাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, শৃঙ্খলা হলো মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো নিয়মনীতি। প্রতিটি সংগঠনেই লিখিত বা অলিখিত আচরণবিধি ও নিয়মাবলি থাকে যার ভিত্তিতে কর্মীদেরকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সার্বিকভাবে সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কর্মীদের সুশৃঙ্খল আচরণ ও নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার অবস্থা প্রকাশ পায়। কর্মীরা যখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ ও আইনকানুন সঠিকভাবে আনুসরণ করে, তখন প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা উত্তম বলে বিবেচিত হয়। আর যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বিধিবিধান মেনে চলে না বা ইচ্ছাকৃতভাবে আইন লঙ্ঘন করে সে প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানে সমস্যা রয়েছে তা স্পষ্ট। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

শৃঙ্খলা বিধান কাজে সাধারণত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। যদিও অধিকাংশ কর্মী এমনিতেই প্রতিষ্ঠানের আদেশ নির্দেশ ও নিয়মনীতি পালন করে চলে, তবুও কিছু কিছু কর্মী রয়েছে যাদের জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনাকে 'শৃঙ্খলা বিধানের' পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। । শৃঙ্খলার কয়েকটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে ধারণা আরো স্পষ্ট হবে । এক্ষেত্রে কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

- Gary Dessler- এর মতে, "শৃঙ্খলা বিধান একটি প্রক্রিয়া যা অধস্তনদেরকে নিয়মনীতি বা পদ্ধতি পরিপন্থী কাজের কারণে ভুলত্রুটি সংশোধন বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে। " (A procedure that corrects of punishes a sub-ordinate because a rule or procedure has been violated.)
- Decenzo & Robbins- এর মতে, "শৃঙ্খলা সংগঠনে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করে যেখানে কর্মীরা নিজেরাই সংগঠনের নিয়মনীতি অনুসরণ করে এবং গ্রহণযোগ্য মানসম্মত আচরণ করে।" (Discipline refers to a condition in the organization where employees conduct themselves in accordance with the organization's rules and standards of acceptable behavior.)
- Mondy & Noe- লেখকদ্বয় বলেন, "কর্মীগণ শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানে কাজের মান বজায় রাখার জন্য কর্মীর ভুলত্রটি সংশোধন বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে"। (Disciplinary action occurs when standards are maintained by involving a penalty against an employee who fails to meet them.)
- Edwin B. Flippo- এর মতে, "শৃঙ্খলা বিধান কাজ হলো শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা যা কর্মীদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে বিরত রাখে"। (Disciplinary action is confined to the application of penalties that lead to an inhibition of undesired behavior.)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শৃঙ্খলা বিধান হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কতকগুলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। শৃঙ্খলা বিধান কার্যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সতর্কীকরণ, পরামর্শ প্রদান, জরিমানা, অপসারণ, কর্মচ্যুতি প্রভৃতি উল্লেখ্য করা যায়। শৃঙ্খলার দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়, একটি ঋণাত্মক অর্থাৎ কতকগুলো নিয়মকানুন যার ভয় কর্মীদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। অন্যটি ধনাত্মক, অর্থাৎ কতকগুলো সুষ্ঠু নিয়মনীতির অনুসরণ যাতে কর্মীরা এমনিতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। মোটকথা, শৃঙ্খলা সুষ্ঠভাবে কর্তব্য সম্পাদনে রীতিনীতির অবস্থিতিকে বুঝায়। বস্তুত শৃঙ্খলাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাপকাঠি। সে কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরেই শৃঙ্খলা থাকা বাঞ্ছনীয়।

### শৃঙ্খলা বিধান কার্যের উদ্দেশ্য
### Objectives of Disciplinary Action

প্রতিটি কাজের পিছনেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। তদ্রুপ শৃঙ্খলা বিধানেরও কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। শৃঙ্খলার অনুপস্থিতিতে একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদন করতে পারে না। কথায় বলে, 'সুস্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, রোগই সংক্রামক'। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা ঘটলে এবং তার যথাযথ প্রতিকার না হলে এ প্রবণতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রতিষ্ঠান শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম গ্রহণ করে। যে সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা নিচে আলোচনা করা হলোঃ

**১। কর্মী মনোবল বৃদ্ধি (Increase Employee Morale)** ঃ কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পেলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

**২। প্রেষণাদান (Motivation)** ঃ কর্মীদের প্রেষণাদান করাও শৃঙ্খলা বিধানের একটি উদ্দেশ্য। কর্মীরা শৃঙ্খলা পছন্দ করে এবং এর অনুপস্থিতিতে তারা নিরুৎসাহ বোধ করে। তাছাড়া শৃঙ্খলা বিধানের ফলে সৎ ও যোগ্য কর্মীরা সঠিকভাবে মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ পায়।

**৩। শ্রম আবর্তন হ্রাস (Reduce Labour Turnover)** ঃ শ্রম আবর্তন ও অনুপস্থিতির হার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। শৃঙ্খলা বিধানের ফলে শ্রমিকদের আবর্তন ও অনুপস্থিতির হার কমে যায় এবং প্রতিষ্ঠানের কাজে স্থিতিশীলতা আসে।

**৪। পরিবর্তনে স্থিতিশীলতা (Stability in Change):** প্রতিষ্ঠানের কোনো আকস্মিক পরিবর্তন কর্মী সহজে মেনে নিতে চায় না। তাই পরিবর্তন বাস্তবায়নেও তারা যথাযথ সহায়তা করে না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রতিকূল আচরণ করে। শৃঙ্খলা বিধান কর্মীদের বিচিত্র আচরণ ও সাংগঠনিক বিভিন্ন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতা দান করে।

**৫। লক্ষ্য অর্জন (Achieve Goal):** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। আর এ লক্ষ্য অর্জন করাই শৃঙ্খলা বিধানের মূল উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলা বিধানের ফলে প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন, রীতিনীতি, শর্তাদি অনুসরণ করা হয়। ফলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

**৬। কর্মী দক্ষতার উন্নয়ন (Develop Employee Efficiency)** ঃ সুশৃঙ্খল পরিবেশে কর্মীরা কর্ম সম্পাদনে সঠিকভাবে মনোনিবেশ করে। এ ধরনের মনোনিবেশ কর্মীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়।

**৭। সন্তোষজনক কার্য পরিবেশ (Satisfactory Working Condition)** ঃ শৃঙ্খলা বিধানের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিবেশ সন্তোষজনক রাখা। ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সন্তোষজনক কার্য পরিবেশ থাকা প্রয়োজন।

**৮। শ্রদ্ধাশীল পরিবেশ সৃষ্টি ঃ (Create a Distinguished Environment) :** শৃঙ্খলা বিধানের অপর একটি উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা। শৃঙ্খলা বিধানের ফলে নির্বাহী ও কর্মীরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনের প্রতি আজ্ঞাবহ থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ বিরাজ করে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যক্রম চালু রাখার জন্য শৃঙ্খলা বিধান একান্ত অপরিহার্য। শৃঙ্খলা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানই উন্নতি করতে পারে না। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা একান্তভাবেই নির্ভর করে কর্মী ও উর্ধ্বতনদের মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপাড়া ও আস্থাশীলতার ওপর। সুতরাং একমাত্র শৃঙ্খলা বিধানের মাধ্যমেই কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে ঐক্যমতে উপনীত হয়া যায়।

### শৃঙ্খলা বিধানের পদক্ষেপ
### Steps in Disciplinary Action

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্মীদের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। কখনো অভিযুক্ত কর্মীকে মৌখিকভাবে সতর্ক, তিরস্কার অথবা সাময়িক অব্যাহতি দিয়ে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করা হয় আবার কখনো অভিযোগ

বা ক্ষতির পরিমাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শৃঙ্খলা বিধান করা হয়। নিম্নে শৃঙ্খলা বিধানের কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো-

শৃঙ্খলা বিধানের পদক্ষেপ

১. প্রাথমিক তদন্ত
২. অভিযোগপত্র তৈরি ও প্রদান
৩. কৈফিয়ত বিবেচনা
৪. তদন্তকারী নিয়োগ
৫. তদন্ত পরিচালনা
৬. তদন্ত প্রতিবেদন পেশ
৭. শাস্তি বিধান
৮. রায়ের বিপরীতে আপিল

চিত্র ১০.১: শৃঙ্খলা বিধানের ধারবাহিক পদক্ষেপ

(১) **প্রাথমিক তদন্ত (Preliminary Enqauary)** ঃ এটি কর্মী শৃঙ্খলা বিধানের গোড়ার ধাপ। কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করেন অথবা প্রত্যক্ষ কর্মীর বরাত দিয়ে একটি অভিযোগ দাঁড় করান। এতে ভবিষ্যৎ অভিযোগ প্রমাণ করা সহজ হয়।

(২) **অভিযোগপত্র তৈরি ও প্রদান (Making of Charge Sheet and Delivery)** ঃ প্রাথমিক তদন্তের ওপর ভিত্তি করেই একটি অভিযোগপত্র তৈরি করা হয়। এ অভিযোগপত্রে অপরাধীর প্রকৃত নাম, ঠিকানা, অপরাধের ধরন, বিবরণ, তারিখ ও সময় উল্লেখ করা হয়। এরপর অভিযোগপত্রটি কর্মীকে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অভিযোগপত্রটি প্রদানের সময় একজন সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে এই মর্মে একটি লিখিত স্বীকারোক্তি নিতে হবে আর অভিযুক্ত কর্মী কর্মস্থলে না থাকলে অভিযোগপত্রটি তার স্থায়ী ঠিকানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) **কৈফিয়ত বিবেচনা (Consideration of Explanation)** ঃ এই পর্বে অভিযুক্ত কর্মী তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়। যদি কৈফিয়ত মনে হয় কর্মীর পক্ষে তাহলে ঘটনার পরিসমাপ্তি সেখানেই ঘটে যায়। আর যদি কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হয় তাহলে পরের ধাপে যেতে হয়।

(৪) **তদন্তকারী নিয়োগ (Appointing investigator)**ঃ অপরাধের মাত্রা এবং বিশেষত্বের ওপর ভিত্তি করে তদন্তকারী নিয়োগ দিতে হবে এই ধাপে। এক বা একাধিক তদন্তকারী তদন্ত কমিটিতে থাকতে পারেন। তবে তদন্তকারী নিয়োগের আগে তার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) **তদন্ত পরিচালনা (Operating Investigations)** ঃ তদন্ত দল বা কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলবে। পাশাপাশি বাদী বা বিবাদী উভয় পক্ষ প্রত্যক্ষ কর্মী সবার সাথেই কথা বলতে হবে। এছাড়াও ঘটনার আলামত সংগ্রহ করে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কাগজপত্রও সংগ্রহ করতে হবে এবং তা পরীক্ষা করতে হবে।

(৬) **তদন্ত প্রতিবেদন পেশ (Submission of Investigation Report)** ঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্তকারী পরিপূর্ণ তদন্ত রিপোর্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবে। তদন্তে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ, সাক্ষীদের সাক্ষ্য, বাদী-বিবাদীর সাক্ষ্য উল্লেখপূর্বক অভিযুক্ত কর্মী দোষী না নির্দোষী তা উল্লেখ করতে হবে।

(৭) **শাস্তি বিধান (Declaring Punishment)** ঃ অভিযুক্ত কর্মী প্রকৃত অর্থে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রতিষ্ঠানের বিধান অনুযায়ী শাস্তি ঘোষনা করতে হবে। শাস্তি বিধানের লিখিত একটি কপি কর্মীর ঠিকানা বরাবর পাঠাতে হবে ও আরেকটি নোটিশ বোর্ডে লাগিয়ে দিতে হবে।

(৮) **রায়ের বিপরীতে আপিল (Appeal Against Verdict) ঃ** কর্তৃপক্ষের ঘোষিত বিচারের রায় কর্মীর মনঃপূত নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে কর্মী পূনঃ বিচার প্রার্থনা করে আবার আবেদন করতে পারে। আবেদন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বরাবর অথবা আদালত বরাবর হতে পারে। তবে কর্তৃপক্ষ বা আদালত আপিল খারিজ করে দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন।

**মূলত ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতি বা পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে কার্যক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধান করা হয়।**

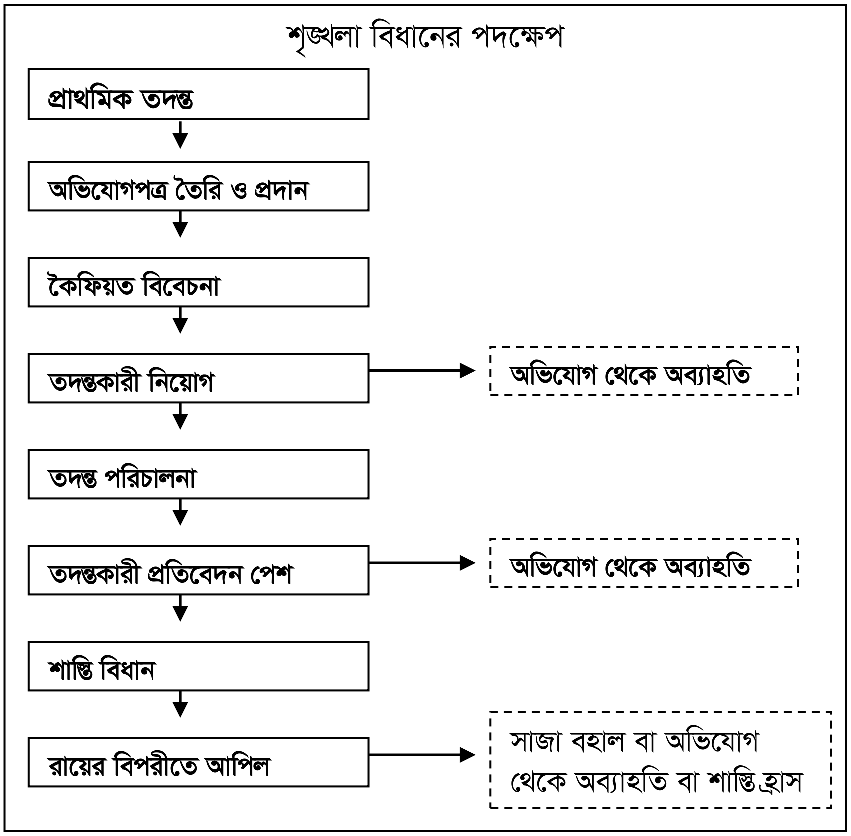


চিত্র-১০.২ : শৃঙ্খলা বিধানের বিস্তারিত পদক্ষেপ

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | শৃঙ্খলা বিধান কী, শৃঙ্খলা বিধান কার্যের উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা বিধানের পদক্ষেপসমূহ খাতায় লিখুন এবং আপনার জ্ঞান ঝালাই করে নিন। |

**সারসংক্ষেপ:**

শৃঙ্খলা বিধান হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কতকগুলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। শৃঙ্খলা বিধান কার্যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সতর্কীকরণ, পরামর্শ প্রদান, জরিমানা, অপসারণ, কর্মচ্যুতি প্রভৃতি উল্লেখ্য করা যায়। শৃঙ্খলার দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়, একটি ঋণাত্মক, অর্থাৎ কতকগুলো নিয়মকানুন যার ভয় কর্মীদের সঠিকপথে চলতে বাধ্য করে। অন্যটি ধনাত্মক, অর্থাৎ কতকগুলো সুষ্ঠু নিয়মনীতির অনুসরণ যাতে কর্মীরা এমনিতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্মীদের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। কখনো অভিযুক্ত কর্মীকে মৌখিকভাবে সতর্ক, তিরষ্কার অথবা সাময়িক অব্যাহতি দিয়ে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করা হয় আবার কখনো অভিযোগ বা ক্ষতির পরিমাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শৃঙ্খলা বিধান করা হয়। শৃঙ্খলা বিধানের কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ হলো-প্রাথমিক তদন্ত, অভিযোগপত্র তৈরি ও প্রদান, কৈফিয়ত বিবেচনা, তদন্তকারী নিয়োগ,তদন্ত পরিচালনা, তদন্ত প্রতিবেদন পেশ, শাস্তি বিধান, রায়ের বিপরীতে আপিল।

# পাঠ-১০.২ শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত নির্দেশনা, বিশৃঙ্খলার কারণসমূহ

**Approaches or Guideline to Disciplinary Action, Causes of Indiscipline**

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শৃঙ্খলা বিধানসংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশৃঙ্খলার কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

## শৃঙ্খলা বিধানসংক্রান্ত নির্দেশনা

## Approaches or Guideline to Disciplinary Action

পূর্ববর্তী পাঠের আলোচনা থেকে আপনি জেনেছেন যে, শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর সাথে এককভাবে আলোচনার মাধ্যমে তাকে তার অপরাধ সম্পর্কে বুঝিয়ে ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায়। আবার সর্বসমক্ষে ভৎর্সনা, শাস্তি প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এমতাবস্থায় সমস্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে শৃঙ্খলা বিধান কাজে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়, যাতে কোনো ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে। শৃঙ্খলা বিধানের তিনটি মতবাদ রয়েছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো-

১. **শৃঙ্খলা বিধান- শাস্তিমূলক হওয়ার চাইতে সংশোধনমূলক হওয়া উচিত (Diciplinary Action - Corrective Rather than Punitive) :** এই মতবাদে বলা হয়েছে যে, শৃঙ্খলা বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান হতে পারে না। এর উদ্দেশ্য হলো কর্মীর বা কর্মীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ সংশোধন করা। শাস্তি প্রদান কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে আসল উদ্দেশ্যটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

২. **শৃঙ্খলা বিধান- প্রগতিশীল মতবাদ (Disciplinary Action- Progressive Approach) :** পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে যথাযথ শৃঙ্খলা বিধান এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে, তবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, শৃঙ্খলা বিধান প্রগতিশীল হবে। এই মতবাদ অনুসারে প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী সর্বোচ্চ অপরাধের জন্যই শুধুমাত্র একজন কর্মীকে বরখাস্ত করা উচিত। প্রগতিশীল মতবাদ অনুসারে, প্রথমে অপরাধীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দিতে হবে, এরপর লিখিতভাবে সতর্ক করে দেওয়া, বরখাস্তকরণ এবং একেবারে মারাত্মক বা অমার্জনীয় অপরাধের জন্য চাকরিচ্যুত করা যাবে।

৩. **শৃঙ্খলা বিধান- উত্তপ্ত ষ্টোভ মতবাদ (Disciplinary Action - The Hot Stove Approach) :** শৃঙ্খলা বিধান কার্যের সঙ্গে উত্তপ্ত ষ্টোভ স্পর্শ করার মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। গরম স্টোভ স্পর্শ করলে তাৎক্ষনিকভাবে ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ হাত পুড়ে যায়। স্টোভ স্পর্শ করলে কি হবে তাও জানা হয়ে যায় এবং এ বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ফলাফল যা পাওয়া যায় তা সব সময়ই সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ উত্তপ্ত উনান ধরলেই হাত পুড়বে। সর্বশেষ বিষয়টি হলো, একজন মানুষ, তা সে যেই হোকনা কেন, যদি উত্তপ্ত সে স্টোভ স্পর্শ করে তবে তার হাত পুড়ে যাবেই, অর্থাৎ ঘটনাটির একটি নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য আছ।

এবার উপর্যুক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যকে শৃঙ্খলা বিধান কাজের ক্ষেত্রে চিন্তা করা যাক। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অপরাধের বিচার সঙ্গে সঙ্গে হওয়া প্রয়োজন এবং শাস্তি বিধানও তাৎক্ষণিকভাবে হতে হবে। তা হলে কর্মী নিশ্চিত হবে যে, তার অপরাধের জন্যই তাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি এবং আইন-কানুন সম্পর্ক যথাযথ জ্ঞান দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও কোন ধরনের আচরণ প্রতিষ্ঠানে গ্রহণযোগ্য, শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কী ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে সে সম্পর্কেও কর্মীদেরকে জানাতে হবে, যাতে তারা আগে থেকেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম কর্মীদের কাছে তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন কর্মীদের আইন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কে তারা অবগত থাকবে।

শৃঙ্খলা বিধান কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকতে হবে। যদি শাস্তি প্রদানের মধ্যে সঙ্গতি না থাকে তবে আইন কানুনের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। এতে কর্মীদের মনোবল হ্রাস পাবে এবং কর্মীরা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। এর ফলে উৎপাদনশীলতাও হ্রাস পাবে। সকল কর্মীই কোনো আচরণকে কোন স্তর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য আচরণ বলা হবে, তা ব্যবস্থাপনার কাছে জানতে চায়। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, একটি প্রতিষ্ঠানে শামীম নামে একজন কর্মী আছেন। কোনো মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোনো একটি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হলো। অথচ ঠিক আগের সপ্তাহে একই অপরাধের জন্য সে কোনো শাস্তি পায়নি। আবার একই অপরাধের জন্য একজন কর্মী শাস্তি পেলেন কিন্তু অন্যজন বেঁচে গেলেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধান কাজের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। তাই শৃঙ্খলা বিধান সর্বক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এই মতবাদের সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয় হলো শৃঙ্খলা বিধান কাজে নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। একজন কর্মীকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান করা যাবে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। অর্থাৎ কর্মী তার অপরাধের জন্যই শুধুমাত্র শাস্তি পেতে পারে। অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর তার সঙ্গে আগের মতই আচরণ করতে হবে। তা না হলে শৃঙ্খলা বিধানের নৈর্ব্যক্তিকতা থাকবে না। উপরের চারটি বিষয়ই উত্তপ্ত স্টোভ মতবাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

## বিশৃঙ্খলার কারণসমূহ

**Causes of Indiscipline**

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য শৃঙ্খলা অপরিহার্য। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য কর্মীদের এককভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য নানা কারণ থাকতে পরে। নিচে উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

**১। উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্যের দায়িত্ব অর্পণ না করা (Nonplacement of the Right Person in the Right Job) ঃ** সঠিক কাজের দায়িত্ব সঠিক ব্যক্তির ওপর অর্পণ না করা হলে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক নিয়োগ না করলে দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

**২। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অপ্রত্যাশিত আচরণ (Undesirable Behaviour of Senior Official) ঃ** অনেক সময় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন পরোয়া করে না। তারা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন বহির্ভূত উপায়ে ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বিরক্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

**৩। ভ্রান্ত মূল্যায়ন (Faulty Evaluatin) ঃ** অনেক সময় নির্বাহীরা কোনো ব্যাক্তির অবমূল্যায়ন করে বা স্বজনপ্রীতি দেখিয়ে কারও প্রতি অন্যায় আচরণ প্রদর্শন করে। ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ কর্মী মূল্যায়নে প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া বদ্ধমূল ধারণা, প্রাথমিক ধারণার ফল, যুক্তির ভুল, প্রত্যাশা প্রভৃতি ব্যবস্থাপকদের সঠিক প্রত্যক্ষণ ও সিদ্ধান্তের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ ধরনের আচরণ প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

**৪। উর্ধ্বমুখী যোগাযোগের অভাব (Lack of Upward Communication) ঃ** অনেক সময় নিম্নস্থ কর্মীদের চিন্তা, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছায় না। যার ফলে কর্মীদের আক্রমণাত্মক (Aggressive) মনোভাব গড়ে উঠে। এতে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

**৫। অযোগ্য নেতৃত্ব (Incompetent Leadership) ঃ** প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি দূর্বল, অনমনীয়, অযোগ্য এবং অধস্তনদের নিকট অবিশ্বস্ত হলে কর্মীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে চাপের মুখে তা পরিবর্তন করলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

**৬। ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বাবধান (Defective Supervision) ঃ** অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কদের পেশাগত দক্ষতার অভাব থাকে। আবার অনেকে কাজ আদায়ের সঠিক কৌশল জানে না। ফলে সে কাজ সম্পর্কে কর্মীদের সঠিক নির্দেশনাদান করতে পারে না। তাছাড়া কাজ আদায়ের দক্ষতার অভাবে কাজের সুসম্পাদন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে কর্মীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

**৭। কর্মীদের খারাপ অভ্যাস (Bad Habit of the Employee) ঃ** কোনো কোনো কর্মী মদ্যপানসহ নানাবিধ খারাপ অভ্যাসে লিপ্ত থাকতে পারে। এ সব খারাপ অভ্যাসের কারণে কর্মীরা তাদের কাজের ওপর মনোযোগ দিতে পারে না। এতে প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

**৮। অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Undesirable Management Practice) ঃ** অনেক সময় কর্মীদের ওপর অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থাপনা নীতি, পদ্ধতি ও প্রযুক্তির পরিবর্তন চাপিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া তাদের ভীতসন্ত্রস্ত রাখা, স্বৈরাচারী ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ প্রভৃতি কর্মীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

**৯। প্রচারের অভাব (Lack of Publicity) ঃ** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নিয়মকানুন ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মীদের সঠিকভাবে অবগত করানো না হলে এগুলোর প্রতি তারা উদাসীন থাকে। আবার তাদের অজ্ঞতার জন্যও সঠিকভাবে শৃঙ্খলা বজায় থাকে না।

**১০। নির্বাহীদের অসৌজন্যমূলক আচরণ (Bad Conduct of the Boss) ঃ** অনেক নির্বাহীর খিটখিটে স্বভাব ও নেতিবাচক মনোভাবের হয়ে থাকে। তারা কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। এতে কর্মীদের মধ্যে নিয়মভাঙ্গার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

**১১। চাপা ক্ষোভ (Latent Anger) ঃ** কোন সমস্যার প্রতিকার লাভে বারবার ব্যর্থ হয়ে কর্মীদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। তাছাড়া অনেক সময় সমস্যার মূলোৎপাটন না করে এর লক্ষণকে লঘু করার চেষ্টা করা হয়। এ সকল সমস্যা শেষ পর্যন্ত আবেগের ভারসাম্যহীনতাসহ নানাবিধ সমস্যার জন্ম দেয় এবং এক সময় বিশৃঙ্খলা বা নিয়ম ভঙ্গের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

**১২। চাকরিগত সমস্যা (Employment Problem) ঃ** কার্য শর্ত, কার্য পরিবেশ, বেতন, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে জটিলতা দেখা দিলে এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা না হলে কর্মীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

**১৩। দলাদলি (Group Conflict) ঃ** কর্মীদের মধ্যে অনেক দল ও উপদল থাকে। এ সমস্ত দল ও উপদলের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ থাকায় তারা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ব্যবস্থাপনাও অনেক সময় এসব দল ও উপদল সৃষ্টি করে। প্রতিষ্ঠানিক কারণ ছাড়াও অনেক সময় ব্যক্তিগত কারণেও কর্মীরা উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

**১৪। রাজনৈতিক প্রভাব (Political Influence) ঃ** শ্রমিক সংঘগুলো কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে থাকে। তাই রাজনৈতিক গোলযোগের প্রভাবেও প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

**১৫। শ্রমিক সংঘের প্ররোচনা (Provocation by the Trade Union) ঃ** অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংঘ দাবি আদায়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রমিকদের আইন অমান্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার শ্রমিক সংঘের প্ররোচনায় সংঘবদ্ধভাবে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারে। ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

ওপরের কারণগুলো ছাড়াও আরও অনেক কারণে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। যে কারণেই বিশঙ্খলা সৃষ্টি হোক না কেন এর প্রতিবিধানের স্বার্থে বিশৃঙ্খলার সঠিক কারণ ও উৎস অনুসন্ধান করতে হয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে তাই ধৈর্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা উচিত।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ ও বিশৃঙ্খলার কারণসমূহ বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকন করুন। |

**সারসংক্ষেপ:**

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা রয়েছে, যে জন্য শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজন হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের দেখতে হবে এই বিশৃঙ্খলা বা আইন ভঙ্গের প্রবণতা বা মাত্রা কতটুকু। উপর্যুক্ত শৃঙ্খলা বিধান কার্য পরিচালনার উদ্দেশে শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পূর্বে কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর সাথে এককভাবে আলোচনার মাধ্যমে তাকে তার অপরাধ সম্পর্কে বুঝিয়ে ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায়। আবার সর্বসমক্ষে ভর্ৎসনা, শাস্তি প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এমতাবস্থায় সমস্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে শৃঙ্খলা বিধান কাজে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়, যাতে কোনো ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে।শৃঙ্খলা বিধান কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকতে হবে। যদি শাস্তি প্রদানের মধ্যে সঙ্গতি না থাকে তবে আইন কানুনের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। এতে কর্মীদের মনোবল হ্রাস পাবে এবং কর্মীরা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। এর ফলে উৎপাদনশীলতাও হ্রাস পাবে। সব কর্মীই একটি আচরণকে কোন স্তর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য আচরণ বলা হবে, তা ব্যবস্থাপনার কাছে জানতে চায়। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, একটি প্রতিষ্ঠানে শামীম নামে একজন কর্মী আছেন। কোন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোন একটি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হলো। অথচ ঠিক আগের সপ্তাহে একই অপরাধের জন্য সে কোনো শাস্তি পায়নি। আবার একই অপরাধের জন্য একজন কর্মী শাস্তি পেলেন কিন্তু অন্যজন বেঁচে গেলেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বিধান কাজের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। তাই শৃঙ্খলা বিধান সর্বক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

# পাঠ-১০.৩ শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়া, বাংলাদেশে শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত আইন, শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পদক্ষেপসমূহ

**Process of Disciplinary Action, Disciplinary Action Related Laws in Bangladesh, Steps for Diciplinary Action**

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়া বলতে করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে শৃঙ্খলা বিধানসংক্রান্ত আইন বর্ণনা করতে পারবেন।
- শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## শৃঙ্খলা বিধান কার্যের সুবিধা
**Benefits of Disciplinary Action**

প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কার্য পরিবেশের স্বার্থেই শৃঙ্খলা অত্যন্ত জরুরি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় থাকলে ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারী সবার জন্যই সুবিধা হয়। এজন্য শৃঙ্খলা বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে শৃঙ্খলা বিধানের গুরুত্ব বা সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. **দলীয় কার্য সম্পাদন নিশ্চিত করে (Ensures Team Work)** ঃ শৃঙ্খলা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের মধ্যে দলীয়ভাবে এবং পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব সহকারে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। শৃঙ্খলা মেনে চললে সবই যথাসময়ে ও যথাযথভাবে নিজ নিজ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পাদন করতে পারে। এতে টার্গেট অর্জন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সন্তোষ ও পুরষ্কারলাভ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বিশৃঙ্খলার ফলে সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারীগণ ইচ্ছা থাকলেও সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করতে পারে না। ফলে দলীয় কার্যের প্রতিও তাদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

২. **কর্মীর পরোক্ষ সন্তুষ্টি (Indirect Satisfaction of Employees)** ঃ কর্মীগণ যদি শঙ্খলাপূর্ণ কাজ করে তাহলে বসের প্রশংসা তাকে স্বস্তিদান করে। পক্ষান্তরে বিশৃঙ্খলপূর্ণ কাজে লিপ্ত হলে বস মৌখিক তিরস্কার করলে সে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পুনরায় সংযত আচরণ প্রদর্শন করতে থাকে। এটা তাকে পরোক্ষভাবে সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে। শৃঙ্খলা বিধান কার্য কর্মচারীদের ভ্রান্ত কার্যের সমালোচনা করে মাত্র, ব্যক্তি হিসাবে কোনো কর্মচারীর সমালোচনা করে না। এতে কর্মচারী নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায়।

৩. **সংযত আচরণ (Consistent Behavior)** ঃ শৃঙ্খলা মেনে না চললে কর্মচারীগণের মধ্যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। শৃঙ্খলা বিধান কর্মচারীদের এই ধরনের মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করে এবং আচরণ সংযত করার জন্য তাগিদ দেয়। এতে করে কর্মচারীগণ তাদের আচরণ সংশোধনের চেষ্টা করে এবং ভবিষ্যতে সংযত আচরণ প্রদর্শনের অনুশীলন করতে থাকে। শৃঙ্খলা বিধান কার্য শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর আচরণই নয় বরং অন্যান্য সব কর্মচারীর আচরণ সংযতকরণের একটি প্রশিক্ষণ।

৪. **অনুকূল কার্য পরিবেশ (Favorable Work Environment)** ঃ শৃঙ্খলা বিধান কার্যের ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিবেশ উন্নত হয়। কেউ যদি বিশৃঙ্খলপূর্ণ আচরণ করে কার্য পরিবেশ অনুপযোগী করে তোলে তাহলে শৃঙ্খলা বিধান কার্যের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসায় কার্য পরিবেশ ও উন্নত হয়। কার্য পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে একদিকে যেমন নিষ্ঠাবান কর্মচারীদের অসুবিধা হয়, তেমন সাধারণ কর্মচারীদের  আয় হ্রাস পায়। এগুলো তারা সহ্য করতে চান না।

৫. **কর্মচারী উন্নয়ন (Employee Development)** ঃ শৃঙ্খলা বিধান কার্যের ফলে প্রতিষ্ঠানে উন্নত কার্য পরিবেশ বিরাজ করে, কর্মচারীগণ মনোবল সহকারে কার্যে রত থাকে ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন তথা উন্নয়ন ঘটে। প্রতিষ্ঠান নিজের

উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার স্বার্থে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়া আরেকটি উপায়ে শৃঙ্খলা কার্যের ফলে কর্মচারীদের উন্নয়ন ঘটে আর তা হলে শান্তিপ্রিয় কর্মচারীগণ সর্বদাই সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে আত্ম উন্নয়ন ঘটাতে চায়।

৬. **উন্নত কর্ম সম্পাদন (Improved Performance) ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা কার্যের ফলে কর্মচারীগন উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনে উৎসাহিত হয় এবং বসের প্রশংসা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় কার্যের মান উন্নত করতে চেষ্টা করে। এতে কেউ বাদ সাধলে তার বিরুদ্ধে কর্মচারীগণই রুখে দাঁড়ায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানে উন্নত কার্য সম্পাদন সম্ভব হয় এবং প্রতিটি কর্মচারী উত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করে দক্ষ ও সুনিপুণ হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা বিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের কী কী সুবিধা অর্জিত হয় তা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে। বস্তুত শৃঙ্খলা কার্য প্রতিষ্ঠানের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর এবং ব্যবস্থাপনার জন্য স্বস্তিকর।

## শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পদক্ষেপসমূহ
## Steps for Diciplinary Action

প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ বজায় রাখতে হলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। তবে এটি প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। নিম্নে শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রমের পদক্ষেপ তুলো ধরা হলো ঃ

**১। শৃঙ্খলা সমস্যার সঠিক বিবরণ (Accurate statement of the disciplinary problem) ঃ** যে কারণে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা শৃঙ্খলা বিধানের প্রথম পদক্ষেপ। এ উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়; যেমন ঃ (ক) শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রকৃতি, (খ) অপরাধের পূর্ণ বিবরণ, (গ) কোন্ অবস্থার জন্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, (ঘ) ঘটনার সাথে কোন্ কোন্ ব্যক্তি জড়িত, (ঙ) উক্ত অপরাধ কখন সংঘটিত হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়গুলো মনে রেখে শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

**২। তথ্য সংগ্রহ (Gathering facts) ঃ** শৃঙ্খলা বিধানের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অনেক কারণ ব্যবস্থাপনার নজরে আনা হতে পারে। তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া না গেলে গৃহীতব্য ব্যবস্থা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হয়। (ক) সঠিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে (খ) প্রত্যেকটি বিষয় সঠিকভাবে পরীক্ষা করতে হবে (গ) তথ্যগুলোকে উত্তমরূপে বাছাই করতে হবে (ঘ) তথ্য সংগ্রহের সময় অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

**৩। প্রাথমিক শাস্তি বিধান (Establishing tentative penalties) ঃ** সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো কর্মচারী অপরাধী মনে হলে শাস্তি প্রদান করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যদি শাস্তি না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হলে গঠনমূলক, ধনাত্মক ও আত্ম-শৃঙ্খলা (self-descipline) ব্যবস্থার প্রতি কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। আর শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে তার ধরন ও আদর্শ শাস্তির (standard penalties) কার্যকারিতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

**৪। শাস্তি নির্বাচন (Choosing penalty) ঃ** শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কর্মীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সেখানে অনেকগুলো বিকল্প বিবেচনা করতে হবে; যেমন ঃ (ক) সাধারণভাবে সতর্কীকরণ, (খ) মৃদু শাস্তি (mild penalty) এবং (গ) কঠিন শাস্তি (drastic penalty)। তবে কোন কর্মীর জন্য কোন্‌টি প্রয়োগ করা হবে তা এ স্তরে নির্বাচন করা হয়।

**৫। শাস্তি প্রয়োগ (Applying penalties) ঃ** শৃঙ্খলা বিধান কার্যক্রমের এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা শাস্তি প্রয়োগ করে থাকে। তবে ব্যবস্থাপনাকে এ মর্মে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের শাস্তি বিধানের সিদ্ধান্ত ন্যায্য ও সঠিক হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সতর্কতার ব্যবস্থা করা হলে বিষয়টি দ্রুতভাবে নিষ্পত্তি করা উচিত। কিন্তু যদি কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে (forth right), আন্তরিক (serious) এবং অনড় (determined) মনোভাব বাঞ্ছনীয়। এ অবস্থায় কোনোভাবেই বিলম্ব করা উচিত নয়। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের সততা সম্পর্কে কর্মীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে।

৬। **শৃঙ্খলা-কার্য অনুসরণ (Follow-up of disciplinary action) ঃ** শৃঙ্খলা বিধানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সুষ্ঠু উৎপাদনশীলতার পরিবেশ নিশ্চিত করা। এর উদ্দেশ্য হলো বিশৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা, ক্ষতিপূরণ নয়। সুতরাং শৃঙ্খলা বিধান প্রয়োগের পরে এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে কর্মীদেরকে প্রেষণাদানের মাধ্যমে বুঝতে হবে যে, তাদের ও কোম্পানির সামগ্রিক কল্যাণে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। নিচে চিত্রের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পদক্ষেপসমূহ দেখানো হলো ঃ

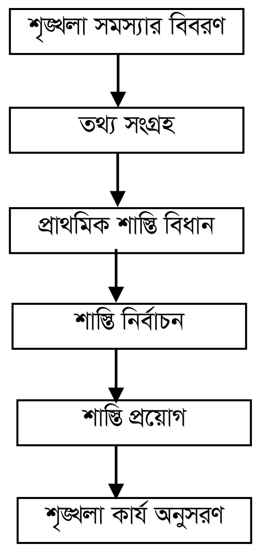


চিত্র-১০.৩ ঃ শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পদক্ষেপ।

## শৃঙ্খলা বিধানের প্রক্রিয়া
## Process of Disciplinary Action

প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানে কতকগুলো পর্যায় বা ধাপ অনুসরণ করতে হয় এবং ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে শাস্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়। চুড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে চাকরিচ্যুতির পূর্বে কর্মীকে সংশোধনের সুযোগ দেয়াই এর উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলা বিধান কার্যে সচরাচর যে সমস্ত ধাপ অতিক্রম করা হয় সেগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হলোঃ

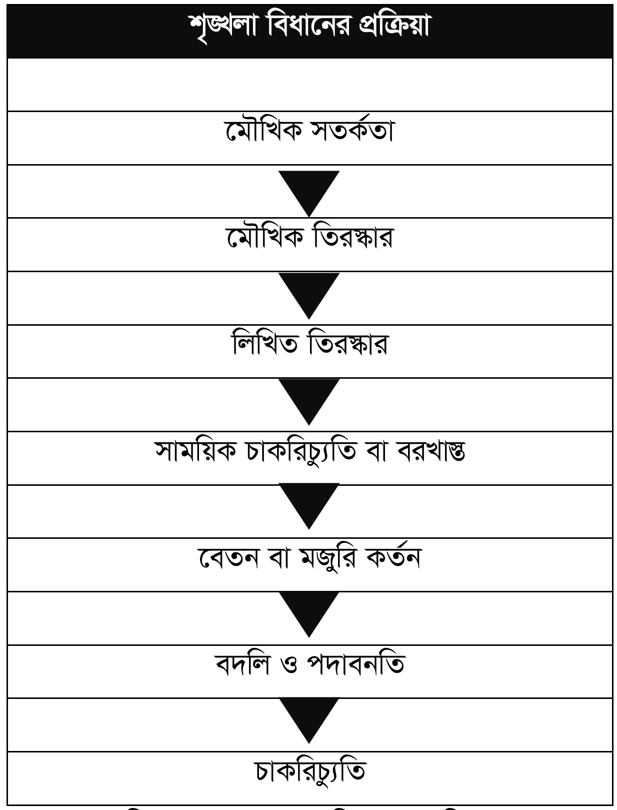


চিত্র-১০.৪ : শৃঙ্খলা বিধানের প্রক্রিয়া

**১। মৌখিক সতর্কতা (Verbal Warnings) ঃ** শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে মৌখিক সতর্কতা। ব্যক্তিগত এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে এটি করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক কর্মীকে জানিয়ে দেন যে, তার কাজ কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং তিনি নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। তিনি আরো জানিয়ে দেন যে, এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। মূলত এরূপ সতর্কতা কর্মীর ছোটোখাটো ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রদান করা হয়।

**২। মৌখিক তিরস্কার (Verbal Reprimand) ঃ** এ পর্যায়ে অভিযুক্ত কর্মীকে কঠোর ভাষায় তিরষ্কার করা হয়। তবে সহকর্মীদের সামনে এরূপ তিরস্কার করা উচিত নয়। কেননা শৃঙ্খলা বিধান কার্যের উদ্দেশ্য হলো কর্মীকে সংশোধন করা, তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা বা তার ব্যক্তিত্বে আঘাত হানা নয়। কারণ এতে কর্মীর মনোবল হ্রাস পায়।

**৩। লিখিত তিরস্কার (Written Reprimand) ঃ** এটা শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধরন। এটা নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে লিখিতভাবে অভিযুক্ত কর্মীকে তিরস্কারের পাশাপাশি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়ে থাকে এবং কর্মীদের পূর্ববর্তী মৌখিক সতর্কতা সম্পর্কে ও উল্লেখ করা হয়। অপরাধের পরিণতি সম্পর্কেও এতে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেয়া হয়।

**৪। সাময়িক চাকরিচ্যুতি বা বরখাস্ত (Suspension) ঃ** উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনের পরেও যদি কর্মীকে সংশোধন করা না যায় এবং কর্মী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে তবে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যায়। এতে সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত কর্মী কাজ করতে পারে না এবং তাকে সে সময়কালের মজুরিও প্রদান করা হয় না। অবশ্য বাংলাদেশে সরকারি অফিসে Suspension Allownce হিসেবে কিছু অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যা মূল বেতনের অর্ধেক ও অন্যান্য ভাতাসহ নির্দিষ্ট উপায়ে হিসাব করা হয়। এ ধাপে কর্মীর অপরাধের তীব্রতানুযায়ী নির্বাহীদের কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় যাতে কর্মী অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

**৫। বেতন বা মজুরি কর্তন (Pay Cut) ঃ** মজুরি কর্তন শৃঙ্খলা বিধানে কদাচিৎ ব্যবহৃত একটি ধাপ। এ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত অপরাধের জন্য বেতন বা মজুরি কর্তন করা হয়। যতদিন পর্যন্ত কর্মী নিজেকে সংশোধন না করছে ততদিন পর্যন্ত বেতন বা মজুরি কর্তন চলতে থাকবে। এমনকি এক বা একাধিক ইনক্রিমেন্ট (Increment) কেটে দিতে পারে।

**৬। বদলি ও পদাবনতি (Transfer and Demotion) ঃ** কখনও কখনও নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক কর্মীকে সংশোধনের সুযোগদানের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা তুলনামূলক ভাবে খারাপ কর্মস্থলে বদলি করা হয়। আবার, অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কোনো কোনো কর্মীকে পদাবনতির মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে এরূপ ব্যবস্থা কর্মীর মনোবল বিনষ্ট করে এবং হতাশা ও নৈরাশ্যে নিপতিত করে। এজন্য যতদূর সম্ভব এ ব্যবস্থা পরিহার করা উচিত।

**৭। বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুতি (Discharge/Dismissal) ঃ** এটা শৃঙ্খলা বিধান কার্য প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপ। উপরিউক্ত কোনো অবস্থাতেই যখন কর্মীকে সংশোধন করা য়ায় না তখন কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মীকে চাকরিচ্যুত করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠান একজন কর্মীকে হারালেও অনুরূপ অপরাধের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পায়। এতে প্রতিষ্ঠান নিজস্ব স্বার্থ ও কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অপরাধের তীব্রতা বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষাকল্পে বরখাস্ত ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এরূপ অবস্থায় কর্মীদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। তবে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুয়িটি প্রভৃতি দিতে হয়।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানে উল্লিখিত যেকোনো পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। তবে প্রথমেই কঠোর শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। লঘু শাস্তি থেকে ক্রমশ কঠোর শাস্তির দিকে অগ্রসর হতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সংশোধনের সুযোগ পায়। আবার সব কর্মীকে একইভাবে শাস্তি দেয়া উচিত নয়। তবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি চাকরি বিধি প্রণয়ন করে পূর্ব থেকে অপরাধ ও শাস্তির বিষয়গুলোকে কর্মীদের অবগতির মধ্যে আনলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার কমে যায়।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়া, বাংলাদেশে শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত আইন, শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পদক্ষেপসমূহ একটি চিত্র অংকন করুন। |

**সারসংক্ষেপ:**

প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কার্য পরিবেশের স্বার্থেই শৃঙ্খলা অত্যন্ত জরুরি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় থাকলে ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারী সবার জন্যই সুবিধা হয়। এজন্য শৃঙ্খলা বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়ার ছয়টি ধাপ রয়েছে : লিখিত মৌলিক সতর্কতা, লিখিত সতর্কতা, বরখাস্ত, পদাবনতি, বেতন বা মজুরি কর্তন, চাকরিচ্যুতি। এই ছয়টি ধাপের মধ্যে পদাবনতি ও বেতন বা মজুরি কর্তন এই দু'টি ধাপ ঘন ঘন ব্যবহার করা হয় না, তবে এই দু'টি ধাপের গুরুত্ব অপরিসীম। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে ব্যবস্থাপক কর্মীকে যে মৌখিক তিরস্কার করেন ব্যবস্থাপক তা লিখিতভাবে নিজস্ব কর্মী ফাইলে রাখেন। এই পদ্ধতিকে লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ বলে এবং এই রেকর্ড একটি সাময়িক রেকর্ড যা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপকদের কাছে থাকে। লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণে কর্মীর সঙ্গে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে ব্যবস্থাপক যে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করেন তার উদ্দেশ্য, তারিখ, ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়। মৌখিক সতর্কীকরণের সঙ্গে লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণের পার্থক্য হলো, মৌখিক সতর্কীকরণে শুধু মৌখিকভাবে কর্মীকে সতর্ক করা হয়। লিখিত সতর্কীকরণ প্রদানের পূর্বে যে কাজগুলো করা হয় তা অনেকটা লিখিত মৌখিক সতর্কীকরণ ধাপের অনুরূপ। যেমন, কর্মীর সঙ্গে একক ভাবে তার শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, এর ফলাফল কী হলো তা জানানো হয় এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের অপরাধের জন্য কী শাস্তি হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়। পার্থক্য হলো যে, এই ধাপে কর্মীকে জানানো হয় যে, তাকে একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হবে।

## পাঠ-১০.৪ শৃঙ্খলা বিধানের নীতিমালা, বাংলাদেশে সরকারি অফিসে শৃঙ্খলা, বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের শাস্তি প্রদান পদ্ধতি

**Principles of Disciplinary Action, Discipline in Government Offices in Bangladesh, Procedure for Punishment for Industrial Labors in Bangladesh**

### উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শৃঙ্খলা বিধানের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে সরকারি অফিসে বিদ্যমান শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের শাস্তি প্রদান পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

### শৃঙ্খলা বিধানের নীতিমালা
### Principles of Disciplinary Action

শৃঙ্খলা বিধানে প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলো মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। নিচে শৃঙ্খলা বিধানের নীতিমালার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ-

**১। আইন সম্পর্কে অবগতি (Communication of the Rules) ঃ** শৃঙ্খলা বিধান সম্পর্কে কর্মীদের স্পষ্ট ধারণা দেয়া উচিত। এতে কর্মীরা নিজকে দায়িত্বশীল মনে করে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানে নবাগত কর্মীদের পরিচিতিকরণ কর্মসূচি এর ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া বিভিন্ন হ্যান্ডবুক ও নোটিশের মাধ্যমে কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বিষয়ে অবগত করানো উচিত। তাছাড়া এ সমস্ত নিয়মকানুন ভঙ্গের শাস্তি বা দন্ড কীরূপ  হবে তাও জানানো উচিত।

**২। অপরাধ প্রমান (Prove the Offense) ঃ** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ পেশ করার পূর্বে ব্যবস্থাপনাকে তা প্রমাণ করতে হবে। কোনো কোনো সময় দেখা যায়, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অপরাধ প্রমাণ না করেই কর্মীকে শাস্তি প্রদান করে। এতে সংঘটিত অপরাধের সাথে আসলেই কে জড়িত তা নিয়ে অন্যান্য কর্মীদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই সুষ্ঠু শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সংগঠিত অপরাধের কারণ এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে।

**৩। সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ (Consistent Treatment) ঃ** শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান ব্যবস্থা অবশ্যই পক্ষপাতহীন হতে হবে। একই অপরাধে শাস্তির পরিমাণ ব্যক্তি বিশেষে ব্যতিক্রম করা চলবে না। এতে আইনের প্রতি কর্মীদের আস্থা নষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়তে পারে।

**৪। পরিস্থিতি বিবেচনা (Consideration of Circumstances) ঃ** প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের আইন অমান্য করার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই নেপথ্যে অন্য শক্তি কাজ করে। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইন্ধনদাতা ও বিশৃঙ্খলার উৎসকে খুঁজে বের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। শৃঙ্খলা বিধানে বিশৃঙ্খলার মূল কারণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর সে কারণেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ আবশ্যক।

**৫। সীমাবদ্ধতার বিধি (Statute of Limitation) ঃ** কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত লিখিত সতর্কবাণীগুলো (Explanations) তাদের ব্যক্তিগত নথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এ সমস্ত নথিগুলো কর্মীদের পরবর্তী সাফল্য ও ভুল সংশোধনের পর ব্যক্তিগত নথি থেকে সরিয়ে ফেলে। তবে উভয় প্রকার ব্যবস্থাতেই এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, কর্মীদের উন্নয়ন কোনোভাবেই যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।

**৬। সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রক্রিয়া (Definite Policy & Procedure) ঃ** প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। কর্মী ও নির্বাহীদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ সমস্ত নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। উল্লিখিত এ সমস্ত নীতিমালা অনুসরণেও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সকলকে মেনে চলা উচিত।

**৭। তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব (Supervisory Responsibility) ঃ** প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব মূলত তত্ত্বাবধায়কদের উপরে ন্যস্ত থাকে। তত্ত্বাবধায়করা কর্মীদেরকে অত্যান্ত নিকট থেকে তত্ত্বাবধান করে। তারা কর্মীদের ভাল কাজে উৎসাহ দান

এবং মন্দ কাজে তিরস্কার করে থাকে। সুতরাং সুষ্ঠু শৃঙ্খলা বিধানের জন্য তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের এ কাজে সকলকে সহযোগী হতে হবে।

**৮। স্বাভাবিক আচরণ (Normal Behaviour) ঃ** কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর তত্ত্বাবধায়কদের কর্মীর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করা উচিত। তাদের সব সময়ই Forgive & Forget মনোভাব পোষণ করা উচিত।

**৯। পরামর্শ (Consultation) ঃ** প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন রচনা করার সময় যতদূর সম্ভব কর্মীদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করতে হয়।

**১০। যুক্তিসংগত নিয়ম ও শাস্তি (Resonable Rules & Penalties) ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনসমূহ যুক্তিসংগত হতে হবে। কর্মীদের নিরাপত্তা, চাহিদা ও সর্বোপরি সামাজিক দিক বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করা হলে কর্মীরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। তাছাড়া নিয়মকানুন এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তিও অপরাধ অনুপাতে যুক্তিসংগত হওয়া উচিত।

**১১। শাস্তি প্রদান ব্যবস্থায় গোপনীয়তা (Disciplinary Action should be taken in private) ঃ** শৃঙ্খলা বিধান কার্যের মূল উদ্দেশ্য হলো ভুল আচরণের সংশোধন। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন বা উপহাসের পাত্রে পরিণত করা নয়। কোনো কর্মীকে তার সমকক্ষদের সামনে শাস্তি প্রদান বা তিরস্কার করলে কর্মীর ব্যক্তিত্ব ও মনোবলে আঘাত হানে এবং সে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে এ দিকটি বিবেচনা করা উচিত।

**১২। শৃঙ্খলা বিধান কার্যের তৎপরতা (Promptness of Disciplinary Action) ঃ** ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে। ' Justice delayed; justice denied '. কোনো আইন ভঙ্গের শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করা হলে কর্মী সংশোধনমূলক ও ইতিবাচক প্রভাব হারাতে পারে। সুতরাং আইন অমান্যের জন্য শাস্তি বা দন্ড প্রদান ব্যবস্থা যথাসম্ভব সময়মত করা উচিত।

**১৩। নেতিবাচক মনোভাবকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে শোধরানো উচিত (Negative Motivation should be Handled in a Positive Manner) ঃ** শৃঙ্খলা বিধান কার্যের দর্শন হলো নেতিবাচক প্রেষণাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মোকাবিলা করা। কর্মীদের মনে এমন মনোভাব গড়ে তোলা উচিত যাতে তার উপলব্ধি করে যে, তাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি। মানবীয় সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির নীতি অনুসারে দোষীকে মানুষ হিসেবে দেখা হয়।

সুতরাং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে নিজেকে সংশোধনপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে প্রতিষ্ঠান ও কর্মী উভয়েই স্বার্থ রক্ষা হয়। সুতরাং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে নিজকে সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দেয়া উচিত। তবে শৃঙ্খলা বিধান কার্যে প্রয়োজনমত নমনীয়তাও থাকা বাঞ্ছনীয়।

### বাংলাদেশে সরকারি অফিসে শৃঙ্খলা
### Discipline in Government Offices in Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অফিসগুলোতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি অফিসগুলোয় শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিত) অধ্যাদেশ- ১৯৮২ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ অনুসারে সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত অফিসে উপস্থিতিসংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. **বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিতির শাস্তি ঃ** যদি কোনো সরকারি কর্মচারী তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ছুটিতে যায় অথবা কাজে অনুপস্থিত থাকে তবে কর্তৃপক্ষ প্রতিদিনের অনুপস্থিতির জন্য একদিনের মূল বেতন কর্তন করতে পারেন।

   **ব্যাখ্যা ঃ** এই ধারার বিধান দুইভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। প্রথমত, ছুটির দরখাস্ত দাখিল করে অনুমোদনের আগেই অফিস ত্যাগ করা এবং দ্বিতীয়, কোনো প্রকার দরখাস্ত না দিয়েই অফিস পরিত্যাগ করা। উভয় ক্ষেত্রেই ধারা সমভাবে প্রযোজ্য, এই ধারার প্রতিদিনের ঘটনার জন্য একদিনের মূল বেতনের সমান অর্থ কাটা যাবে। বাড়ি ভাড়া ভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি কর্তন করা যায় না। প্রতি মাসের বেতন বিল হতে এই অর্থ কাটতে হবে। তবে সেলফ্ ড্রয়িং অফিসারের (Self Drawing Officer) বেলায় বেতন বিল হতে এই অর্থ কর্তন করার নির্দেশ দিয়ে তাকে ও সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে একথা জানাতে হবে। তিনি (সেলফ্ ড্রয়িং অফিসার) যদি কর্তন না করেন তাহলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ওই পরিমাণ অর্থ কর্তন করবেন। সেই সঙ্গে উক্ত দিন বিনা বেতনে ছুটি হিসাবে গণ্য হবে।

২. **বিনানুমতিতে অফিস ত্যাগের শাস্তি ঃ** যদি কোনো কর্মচারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে অফিস চলাকালীন অফিস ত্যাগ করে তবে কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ঘটনার জন্য একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কাটতে পারবে।

**ব্যাখ্যা ঃ** বিনা প্রয়োজনে ঘন ঘন ডেস্ক পরিত্যাগ করা যাবে না। কোথাও যেতে হলে গন্তব্যস্থান ও ফিরে আসার সময় সম্পর্কে পার্শ্ববতী ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে।

৩. **বিলম্ব উপস্থিতির শাস্তি ঃ** যদি কোনো সরকারি কর্মচারী দেরিতে অফিসে আসেন তবে কর্তৃপক্ষ প্রতি দুই দিনের বিলম্বে উপস্থিতির জন্য এক দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করতে পারবে।

**ব্যাখ্যাঃ** অফিস সময় শুরু হওয়ার এক মিনিট পর অফিসে উপস্থিতির জন্যও শাস্তি প্রদান করা যায়। যানবাহন না পাওয়া, খারাপ আবহাওয়া, সরকারি যানবাহন দেরিতে আসা বা অপরিহার্য ব্যক্তিগত কাজ কোনো বৈধ অজুহাত হিসাবে গণ্য হবে না।

৪. **অপরাধ পুনরাবৃত্তির শাস্তি :** কোনো সরকারি কর্মচারী ৩০ দিনের মধ্যে উপরের **১**,২ ও ৩ নম্বর এ বর্ণিত অপরাধ একাধিকবার করলে কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ৭ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করতে পারবে।

**ব্যাখ্যাঃ** ৩০ দিনের মধ্যে বিনানুমতিতে কার্যে অনুপস্থিতি, বিনানুমতিতে অফিস পরিত্যাগ বা বিলম্বে উপস্থিতি যদি একের অধিকবার সংঘটিত হয় তবে উপর্যুক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া আরো ৭ দিনের মূল বেতন কর্তন করা যেতে পারে। যেমন -৪ দিন বিলম্বে উপস্থিতির জন্য ২+৭ =৯ দিনের মূল বেতনের সমান অর্থ কাটা যাবে। অভ্যাসগত অপরাধীদের বেলায় সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা আপিল বিধি **১৯৮৫** এরে আওতায় বিভাগীয় মামলা রুজু করতে হবে।

৫. **পুনর্বিবেচনার আবেদন :** কোন সরকারি কর্মচারী এই আইনের উল্লিখিত **১**, ২, ৩ ও ৪ নম্বর পয়েন্টে উল্লিখিত অপরাধের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হলে ওই সরকারি কর্মচারী আদেশ প্রাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ওই আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য বাতিল অথবা বহাল রাখতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ শাস্তির আদেশ অভিযুক্তকে যথারীতি জানাতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী পিওন বইয়ে লিপিবদ্ধ করে অথবা রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে উক্ত আদেশ জানা হয়। উভয় অবস্থাতে আদেশ প্রাপ্তির সার্ভিস রিটার্ন থাকতে হবে। আদেশ গ্রহণ অথবা গ্রহণে অস্বীকৃতির বেলায় প্রদানের প্রস্তাবের সময় হতে ৪৮ ঘন্টা গণনা করা হবে। উক্ত ৪৮ ঘন্টা পর তার কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। এরূপ অবস্থায় অভিযুক্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরের ঘটনার জন্য অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টার পর পুনর্বিবেচনার জন্য দরখাস্ত গ্রহণ করা যাবে। পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে শুধু সাক্ষীর স্মারক, সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

৬. **পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শ :** সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা নিয়মিত উপস্থিতি অধ্যাদেশ-**১৯৮২** এর কোন বিষয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শের কোনো আবশ্যকতা নেই।

**ব্যাখ্যাঃ** যেসব ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ প্রয়োজন হয় তা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন রেগুলেশন) **১৯৭৯** তে উল্লেখ আছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধি-**১৯৮৫** এর ৭ (৭) বিধি মোতাবেক গুরুতর শাস্তির ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু এই অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তির ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শের কোনো আবশ্যকতা নেই।

৭. **আদালতের এখতিয়ার রহিতঃ** বর্তমানে অধ্যাদেশের আওতায় কোনো কার্যক্রম বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

**ব্যাখ্যা ঃ** এই আদেশের অধীনে কোনো কার্যক্রম বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি আদালতে বা প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যলে কোনো প্রকার মামলা দায়ের করা যাবে না।

## বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের শাস্তি প্রদান পদ্ধতি

### Procedure for Punishment for Industrial Labors in Bangladesh

**১৯৬৫** সালের শ্রমিক নিয়োগ আইনের **১৮** নম্বর ধারা মতে কোনো শ্রমিককে (স্থায়ী) কর্মচ্যুত (Discharge) বা পদচ্যুত (Dismissal) করা যাবে না, যদি-

(ক) তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা না হয়।

(খ) তাকে যদি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের কপি না দেয়া হয় এবং কৈফিয়ত দেয়ার জন্য কমপক্ষে তিন দিনের বেশি সময় না দেওয়া হয়।
(গ) সে তার বক্তব্য শুনানির জন্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও শুনানির সুযোগ দেয়া না হয়।
(ঘ) মালিক বা ব্যবস্থাপনা এরূপ আদেশ অনুমোদন না করে।

উপরের শর্তগুলো পালন ছাড়াও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে নিচের প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়ঃ
(ক) প্রয়োজনে প্রাথমিক তদন্ত করা;
(খ) অভিযোগপত্র তৈরিকরণ;
(গ) অভিযোগপত্র প্রদান;
(ঘ) অভিযোগপত্রের জবাব বিবেচনা করা;
(ঙ) তদন্তকারী নির্বাহীর মনোনয়ন;
(চ) তদন্তের নোটিশ প্রদান;
(ছ) সঠিকভাবে অভ্যন্তরীণ তদন্তকরণ;
(জ) তদন্তকারী নির্বাহীর প্রতিবেদন;
(ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা;
(ঞ) ত্রুটি অনুযায়ী শাস্তি পদান;
(ট) শাস্তির আদেশ জারি করা।

শুধুমাত্র পদচ্যুতি ও কর্মচ্যুতির ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতপক্ষে যেকোনো ধরনের শাস্তি প্রদানের পূর্বে কর্তৃপক্ষকে ওপরের পদক্ষেপগুলো অবশ্যই বিবেচনা করা হবে। অন্যথায় আইনের চোখে সে শাস্তিযোগ্য হবে না এবং শ্রম আদালতে মামলা হলে মালিকপক্ষ পরাজিত হবে।নিচে শাস্তিবিধান কার্য পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায়গুলো আলোচনা করা হলোঃ

**প্রথম পর্যায় ঃ** অভিযোগপত্র দেবার পূর্বে একটি প্রাথমিক তদন্ত করে নেয়া ভাল। কারণ এতে ঘটনার গুরুত্ব আগে থেকেই বুঝতে পারা যায়। অতঃপর অভিযোগপত্র রচনা করা হয়। এ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়। অভিযোগপত্র খুবই সতর্কতার সাথে রচনা করতে হয়। এতে আইনের ধারাগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করে অফিস কপিতে তারিখসহ তার স্বাক্ষর নিতে হয়। উত্তর প্রদানের জন্য তাকে কমপক্ষে তিনদিন সময় দিতে হয়।

**দ্বিতীয় পর্যায় ঃ** এ পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের উত্তর প্রদান করে। কর্মী তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারে। অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারে। অভিযোগ স্বীকার করলে আর কোনো তদন্তের প্রয়োজন হয় না। অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী তাকে সতর্কীকরণ বা অন্য কোনো প্রকার শাস্তি দেয়া হয়। অভিযোগ অস্বীকার করলে বা উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে অথবা উত্তর না দিলে আনুষ্ঠানিক তদন্ত করা হয়। তদন্ত পরিচালনার জন্য একজন অফিসার নিয়োগ করা হয়। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে তদন্ত ব্যাপারে ৩/৪ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

**তৃতীয় পর্যায় ঃ** তৃতীয় পর্যায়ে অভিযোগকারীকে তদন্তের নোটিশ প্রদান করা হয়। তদন্ত কমিটির সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হতে হয়। এ সময়ে তার সাথে কর্তৃপক্ষ ও সাক্ষীরা উপস্থিত থাকতে পারে। অভিযুক্ত শ্রমিক তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত না হলে তদন্তকারী অফিসার এক তরফা তদন্ত করতে পারে। এক তরফা তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব আরও অনেকগুণ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির নোটিশ পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হয়। মনে রাখতে হবে তদন্তের সময় উপস্থিত না থাকার অর্থ নিজের দোষ স্বীকার করে নেয়া নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারকে সাধারণ তদন্তের মতই সাক্ষীদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ঘটনা প্রমাণ করতে হয়। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকলে তদন্ত অফিসারকে অভিযোগগুলোকে পড়ে শোনাতে হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান কররা হয়। সাক্ষীদেরও জেরা করা হয়। অতঃপর লিখিত কপিতে অভিযুক্ত ব্যাক্তি ও সাক্ষীদের তারিখসহ দস্তখত বা আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হয়। তদন্তকারী অফিসারও এতে দস্তখত প্রদান করে।

**চতুর্থ পর্যায় ঃ** তদন্ত শেষ হওয়ার পরপরই তদন্ত রিপোর্ট লিখতে হয়। তদন্তকারী অফিসার অভিযুক্তের উত্তর এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন। এর মাধ্যমে কর্মীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে কি না তা পরিষ্কারভাবে প্রতিবেদন জানান। দোষী প্রমাণিত হয়ে থাকলে, তবে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে শাস্তির সুপারিশ করেন এবং রিপোর্টটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন। তদন্ত রিপোর্ট লেখার সময় নিচের রীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়:

(ক) রিপোর্টের প্রথমাংশে অভিযোগের বর্ণনা দিতে হয়।

(খ) প্রধান প্রধান সাক্ষীদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উল্লেখ করতে হয়।

(গ) অভিযোগ প্রমাণিত হলে কীভাবে তা প্রমাণিত হয়েছে তা লিখতে হবে। তদন্ত রিপোর্টের সিদ্ধান্ত অংশটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর পিছনে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ থাকতে হবে।

**পঞ্চম পর্যায় ঃ** এ পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ তদন্ত রিপোর্টটি বিবেচনা করেন। নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। আর দোষী প্রমাণিত হলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তিবিধান করা হয়। সবশেষে শাস্তির আদেশ জারি করা হয়।

১৯৬৫ সালের কর্মী নিয়োগ আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তির আদেশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তা পুনর্বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারে। আবেদনপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য ব্যক্তিগতভাবে শুনে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হোক না হোক তা জানাবেন ।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | শৃঙ্খলা বিধানের নীতিমালা, বাংলাদেশে সরকারি অফিসে শৃঙ্খলা, বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের শাস্তি প্রদান পদ্ধতিসমূহ বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকনকরুন। |

**সারসংক্ষেপ:**

শৃঙ্খলা বিধানে প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলো মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অফিসগুলোয় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি অফিসগুলোয় শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিত) অধ্যাদেশ- ১৯৮২ জারি করেন। প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা রয়েছে, যে জন্য শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজন হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের দেখতে হবে এই বিশৃঙ্খলা বা আইন ভঙ্গের প্রবণতা বা মাত্রা কতটুকু। উপর্যুক্ত শৃঙ্খলা বিধান কার্য পরিচালনার উদ্দেশে শৃঙ্খলা বিধান কার্যের পূর্বে কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর সাথে এককভাবে আলোচনার মাধ্যমে তাকে তার অপরাধ সম্পর্কে বুঝিয়ে ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায়। আবার সর্বসমক্ষে ভৎর্সনা, শাস্তি প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এমতাবস্থায় সমস্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে শৃঙ্খলা বিধান কাজে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়, যাতে কোনো ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে। শৃঙ্খলা বিধান কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকতে হবে। যদি শাস্তি প্রদানের মধ্যে সঙ্গতি না থাকে তবে আইন কানুনের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। এতে কর্মীদের মনোবল হ্রাস পাবে এবং কর্মীরা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। এর ফলে উৎপাদনশীলতাও হ্রাস পাবে। সব কর্মীই একটি আচরণকে কোন স্তর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য আচরণ বলা হবে, তা ব্যবস্থাপনার কাছে জানতে চায়।

## ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. শৃঙ্খলা বিধান কী তা বর্ণনা করুন।
২. শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সমস্যার ধরন বর্ণনা করুন।
৩. বিশৃঙ্খলার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৪. শৃঙ্খলা বিধান কার্যের উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।
৫. একটি প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য কী কী কারণ দায়ী বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন।
৬. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কারণসমূহের সমাধানের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৭. শৃঙ্খলা বিধান প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৮. বাংলাদেশে শৃঙ্খলা বিধানসংক্রান্ত আইন আলোচনা করুন।
৯. কোনো প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়ে থাকে? বর্ণনা করুন।
১০. শিল্প প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বাংলাদেশে কী কী আইন অনুসরণ করা হয়? লিখুন।
১১. 'শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান করা' এ কথার সঙ্গে কি আপনি একমত? মতামত ব্যাখ্যা করুন।
১২. শৃঙ্খলা বিধানের নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করুন।
১৩. বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের শাস্তি প্রদান পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।
১৪. বাংলাদেশে সরকারি অফিসে শৃঙ্খলা অবস্থা বর্ণনা করুন।

**রেফারেন্স বইসমূহ**


- Gary Dessler, Human Resource Management, Latest Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.
- Wiliam Aurther & Keith Davis, Human Resource Management, Latest Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.